সুবর্ণবণিক্‌কুল উদ্ধারকারী সাধুপুঙ্গব

ঠাকুর

উদ্ধারণ দত্ত

শ্রীদীননাথ ধর, বি. এল. প্রণীত

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদদাস বড়ালের ব্যয়ে মুদ্রিত

কলিকাতা

৪৬ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট

হেয়ার প্রেসে

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩১১



শ্রীপ্রসাদদাস বড়াল,

প্রিয়জনেষু,

চিরায়ুষ্মৎসু,

এই পুস্তিকা লিখিবার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ কর; সাধ্যমত লিখিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইলে আনন্দ লাভ করিব। আর এতদ্‌পাঠে এক জনেরও মন দত্তঠাকুরের শ্রীপাটের দিকে আকৃষ্ট হইলে কৃতার্থ হইব।

নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া দত্তঠাকুর নিজে উদ্ধৃত হন এবং সুবর্ণ বণিক্ জাতিরও উদ্ধার করেন। দত্তঠাকুর-অবলম্বিত পরম পথের অনুসরণে সুবর্ণবণিক্ জাতি উন্নত হইবার আশা করিতে পারেন।

সাবিত্রী সূত্র গ্রহণ, অশৌচ-কাল-সঙ্কোচন, গায়ত্রী জপন এবং দে, দাস বদ্‌লে ভূতি ইত্যাদি আখ্যা গ্রহণ চেষ্টা না করিয়া সরল পূতঃ চিত্তে "নাম সংখ্যা" করণে এবং তুলসীর মালা ধারণে সুবর্ণবণিক্‌গণ কেবল বিদ্বেষ-মূলক বল্লালের আদেশের ঘোর অনিষ্টকর ফল নিষ্ফল করিতে পারেন।

তপশ্চরণে বিশ্বামিত্র ঋষিত্ব লাভ করেন। ধর্ম্মাচরণে, সদাচরণ অনুষ্ঠানে, সমাজনেতা বিপ্রগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনে, সুবর্ণবণিক্‌গণ আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়া সামাজিক উন্নতিলাভ করিতে পারেন।

বলা আবশ্যক যে তুমি এই পুস্তিকা মুদ্রণের সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করিয়াছ।

চুচুড়া
শ্যামবাবুর ঘাট।
১লা বৈশাখ,
১৩০১ সাল।

তোমার সর্ব্ববিধ শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদীননাথ ধর

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর।

প্রথম অধ্যায়।

সপ্তগ্রাম সাতটি পৃথক্ পৃথক্ গ্রামের সমষ্টি। সেই গ্রামগুলির নাম, বাসদেবপুর, (বাসুদেবপুর), বাঁশবেড়ে (বংশবাটী), কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খনগর এবং গ্রাম সপ্তগ্রাম। কৃষ্ণপুর দাস গোস্বামীর শ্রীপাট, দত্ত ঠাকুরের "পাটবাড়ী" হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ। কৃষ্ণপুরে বৎসর বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিবসে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই দিন ত্রিবেণীতেও একটি মেলা হয়। অনেক লোক ত্রিবেণীতে প্রাতঃস্নান করিয়া কৃষ্ণপুরে আসিয়া রন্ধনাদি করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করে। ত্রিবেণী হইতে কৃষ্ণপুর দেড় ক্রোশ।

নিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল সপ্তগ্রামে ছিলেন ;

সম্ভবতঃ তাঁহার নামেই নিত্যানন্দপুরের নাম হইয়া থাকিবে। এই সাতটি গ্রাম আজিও বর্ত্তমান এবং পাশাপাশী অবস্থিত। একটি হইতে আর একটি বেশী দূর নয়। আর ত্রিবেণী হইতে সপ্তগ্রাম এক ক্রোশ। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম এবং ত্রিবেণী একই জনপদ ছিল। ত্রিবেণী ভাগীরথী, সরস্বতী এবং যমুনা, এই সুরনদীত্রয়ের সঙ্গম স্থান। এখানে পুরাকালে অনেক দেবদেবীর মন্দির ছিল। সচরাচর সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষদের এস্থানে সমাগম হইত। বোধ হয় এজন্যই সপ্তগ্রামের কয়েকটী গ্রামের নাম দেবতাদের নামানুসারে হইয়া থাকিবে।

গ্রাম সপ্তগ্রামের উত্তরপশ্চিমে সরস্বতী নদী, পূর্ব্ব ও উত্তরে গঙ্গা এবং দক্ষিণে দেবানন্দপুর। সপ্তগ্রামেই উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট। ইহাকে তথাকার লোকে পাটবাড়ী বলে। চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানাপেক্ষা পাটবাড়ী অনেকটা উচ্চ। স্থানটি অস্বাস্থ্যকর নয়। নিকটে পূর্ব্বদক্ষিণে লোকের বাস এবং দুই একখানি মুদির দোকান আছে। আশপাশে ক্ষেত খোলাও দেখা যায়। পূর্ব্বে এইখানে বেণেপাড়া নামে একটি পল্লী ছিল।

পাটবাড়ীর নিকট দিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

সপ্তগ্রাম হুগলির উত্তরপশ্চিম; রেলপথে হাওড়া হইতে তের ক্রোশ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হুগলি ষ্টেষণের পরই ত্রিশবিঘা ষ্টেষণ। ইহা হুগলি ষ্টেষণ হইতে দেড় ক্রোশ। ত্রিশবিঘা ষ্টেষণ হইতে দত্ত ঠাকুরের পাটবাড়ী আধ পোয়ার কিছু বেশী। এই পথটুকু অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পারা যায়। আর আবশ্যক হইলে ত্রিশবিঘা ষ্টেষণে ঘোড়ার গাড়িও মিলিতে পারে। উক্ত পথটি পাকা এবং তাহাতে গাড়ী বেশ চলে। এই পথে খানিক দুর গিয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ পাওয়া যায়। এই সংযোগস্থলে ট্রাঙ্ক রোড্টি একটু পশ্চিম হইয়া পাটবাড়ীর নিকট দিয়া উত্তরে গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া অল্পক্ষণ যাইয়া একটি বড় পাকুড় গাছের নিকট উপস্থিত হইতে হয়; পরে একটি ছোট কাঁচা পথে, প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে প্রায় এক শত হাত, তৎপরে এই কাঁচা পথেই আর কিছুদূর উত্তরে যাইলে পাটবাড়ীতে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই কাঁচা পথটি চার—পাঁচ শত হাতের বেশী নয়। অল্প ব্যয়ে পাকা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। পাটবাড়ীর কর্ত্তাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। এই রাস্তাটি পাকা হইলে ঘোড়ার গাড়ী একেবারে পাটবাড়ীর দ্বারে যাইতে পারিবে। তাহা হইলে পাটবাড়ীর যাত্রীদের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, যে কোন নিত্যানন্দ স্বরূপের ভক্ত এক টাকা মাত্র ব্যয়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা হইতে পাটবাড়ী আসিয়া তথায় দর্শনাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাটবাড়ীতে স্নান ও পানীয় জলের অভাব ও কষ্ট নাই। ইহার মধ্যে নূপুরকুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহার জল সুন্দর ও সুমিষ্ট এবং বেশ পরিষ্কার। হাওড়া রামকৃষ্ণপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিচরণ মল্লিক মহাশয় পাটবাড়ীর সন্নিহিত কয়েক বিঘা জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া তথায়

একখানি পাকা বাড়ী প্রস্তুত করাইতেছেন। বাড়ীখানি একটি ধর্ম্মকুটীর সদৃশ হইবে। তাহাতে হরিচরণ বাবু সময়ে সময়ে একা অথবা পরিবার সহ থাকিবার মানস করিয়াছেন। এই বাড়ীর নীচে একটি পুষ্করিণী আছে। হরিচরণ বাবু সেটি ভাল করিয়া কাটাইয়া দিবেন, এই রূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন। শ্রীপাটের যাত্রীরা ইহাতে স্নানাদি করিতে পারিবেন। এটি পাটবাড়ীর সদর দরজার সিঁড়ির সংলগ্ন।

কোম্পানীর কাগজের প্রখ্যাত কারবারী বাবু প্রসাদ দাস বড়ালও পাটবাড়ীর নিকট কয়েক বিঘা জমির স্থায়ী বন্দোবস্ত লইবার মানস করিয়াছেন। তাহাতে বিশ্রামভবন স্বরূপ একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া অবসরমত তথায় যাইয়া একা অথবা সপরিবারে থাকিবার তাঁহারও ইচ্ছা।

অন্যান্য ভাগবতগণও এইরূপ করিলে তাঁহাদের নিজের শ্রেয়ঃ এবং তৎসঙ্গে পাটবাড়ীর উন্নতিরও সম্ভাবনা। সুবর্ণ বণিক্‌দের অর্থের অভাব নাই। কলিকাতার সান্নিধ্যে আরামার্থ তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আরামবাড়ী প্রস্তুত করাইয়া থাকেন।

সেই সঙ্গে সুবর্ণ বণিক্ কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ীর নিকট দুই একটি আশ্রম-আবাস প্রস্তুত করাইলে তাঁহাদের নিজের ও অন্যের মঙ্গল হয় এবং সুবর্ণ বণিক্ জাতির একটি পরম কীর্ত্তি রক্ষা পাইতে পারে।

পাটবাড়ীর ঠাকুরদের সেবা পূজার এবং ভোগ-রাগের যেরূপ বন্দবস্ত আছে, তাহাতে দর্শনার্থ তথায় আসিয়া কোন লোকের অভুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। নূপুর কুণ্ডের জল উঠাইয়া তাহাতে স্নান করিয়া মহাপ্রভুর প্রসাদ পাইয়া এবং পাটবাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া যে কোন যাত্রী স্বচ্ছন্দে পাট-বাড়ীতে ২।৪ ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে পারেন।

পাটবাড়ীর ঠাকুরদের অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দুইজন ভাল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ আছেন। তন্মধ্যে একজন নিত্য "ভোগরাগ" প্রস্তুত করেন। মহোৎসব ভিন্ন অন্য সময়ে যাইয়া আমি ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইয়াছি। ভাগবত না হইলেও সেই প্রসাদ সামান্য ভদ্র লোকের কষ্ট-সেব্য নহে। আর বেলা দুই প্রহরের মধ্যেই পাট-বাড়ীর মহাপ্রভুর অন্নভোগ হইয়া থাকে।

পাটবাড়ীর শ্রীমন্দির সম্মুখে যে নাটমন্দির এবং তাহার পূর্ব্বদক্ষিণে যে ঘর আছে, তাহাতে যাত্রীরা অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে শুইতে বসিতে পারেন। পাটবাড়ীর পূজারী ও পাচক ব্রাহ্মণ বেশ শিষ্টাচারী এবং মালী ও চাকরেরা যাত্রীদের প্রতি সমুচিত সমাদরসম্পন্ন। ইহাদের স্থানে এইরূপ সদ্ব্যবহারই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। দত্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ রামের সেবক এবং নিত্যানন্দ প্রভু দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতির প্রতিকৃতি ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাটবাড়ী হইতে দক্ষিণে নামিয়া একটি "দো-পেয়ে" পথ দিয়া পশ্চিমে খানিক দূর যাইলে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ পাওয়া যায়। তথা হইতে অল্প দূরে উত্তর পশ্চিমে সরস্বতী নদীর নূতন পুল। এই স্থানে নদীটি অতি ক্ষুদ্র হই-লেও চৈত্র বৈশাখে তাহার প্রশস্ততা বিশ হাতের কম নহে। এ সময়েও তাহাতে তিন হাত জল থাকে এবং তাহা সুন্দর পরিষ্কার।

বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে সপ্তগ্রামে সরস্বতী প্রবাহশূন্যা। বর্ষায় বর্দ্ধিতদেহা হইয়া আয়তনে হুগলির সন্নিহিত গঙ্গার এক চতুর্থাংশের সমান হন। তখন নৌকাযোগে পাটবাড়ী হইতে পোয়া ঘণ্টার মধ্যে ত্রিবেণী যাওয়া যায়।

কথিত "দোপেয়ে" পথটির সামান্য সংস্কার এবং সরস্বতীতে নামিবার নিমিত্ত নূতন পুলের পূর্ব্বোত্তর ধার দিয়া একটি মেটে ঘাট প্রস্তুত হইলে শ্রীপাটের যাত্রীরা সরস্বতীতে স্নান আহ্নিক করিয়া মহাপ্রভু দর্শন করিতে পারেন। এইরূপে সরস্বতী নদীর ব্যবহার হইতে থাকিলে উহার সংস্কার হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু সরস্বতী পুণ্যসলিলা। তাহার জলে মহাপ্রভুর অন্নব্যঞ্জনও প্রস্তুত হইতে পারিবে।

পাটবাড়ীর নিকট জমির অভাব নাই। সামান্য জমায় কতকটা জমি লইয়া তাহাতে একটি বাজার বসাইতে পারিলে ভাল হয়। পাটবাড়ীর চতুঃপার্শ্বস্থ নিকটের গ্রামাদি হইতে হুগলি, বালি ও ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানের হাট বাজারে "তরিতরকারি" আসিয়া থাকে। পাট-

বাড়ীর নিকট একটি বাজার বসিলে হুগলি, বালি এবং ত্রিবেণীর চাষী ও হাটুরে লোকের তথায় যাইবার সম্ভাবনা। আর সামান্য একটি ঔষধালয় সংস্থাপনের চেষ্টা করা সঙ্গত। সপ্তগ্রাম শ্রীকৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামে বোধ হয় তেমন চিকিৎসক, বৈদ্য নাই। অনেক নূতন বৈদ্য ও নেটিভ্ ডাক্তার ও হোমিওপ্যাথের সহর অঞ্চলে বড় কিছু হয় না। ইহাদের মধ্যে দুই এক জনকে পাটবাড়ীর নিকট চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। শ্রীপাট সংস্করণ সমিতির অন্যতম সুযোগ্য সম্পাদক বাবু কালীচরণ দত্তের এই দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে। তিনি যেরূপ উদ্যোগী ও যত্নশীল, আন্তরিক চেষ্টা করিলে যে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না এমন মনেই হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম আর পূর্ব্বের সেই সপ্তগ্রাম নহে। পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম একটি মহা সমৃদ্ধিশালী, বহুজনাকীর্ণ জনপদ ছিল, এখন তাহা প্রায় জন-

শূন্য, জঙ্গলময়। বণিক্, ব্যবসায়ী, রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারী এবং সেনা সামন্তাদির পরিবর্ত্তে, এখন তাহা শৃগাল, কুকুর, সর্প,সরীসৃপের আবাসভূমি। ২৭০।৭১ বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতী নদী একটি বৃহতী স্রোতস্বতী ছিল। তাহার বক্ষে নিয়ত জাহাজাদি বিরাজ করিত। এখন শৃগাল কুকুরও তাহা হাঁটিয়া পার হয়। এখন তাহাতে শালতী, ডোঙ্গা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। সরস্বতী এখন কেবল নামে স্রোতস্বতী ; তাহাতে এখন স্রোত একেবারেই নাই।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সপ্তগ্রাম সপ্তঋষির স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত। পুরাণ বিশেষে উক্ত যে কান্যকুব্জরাজ প্রিয়বন্তের সাতটি পুত্র ছিল, এবং সেই সাতটিই এক একটি ঋষি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই সপ্তগ্রামে বাস করিতেন এবং অগ্নিড্র দ্যুতিমন্ত প্রভৃতি সপ্তগ্রামস্থ সাতটি গ্রামের নাম এই সাতটি ঋষির নামে হইয়াছিল। রোমক গ্রন্থকার প্লিল্নির সময় হইতে পর্ত্তুগিজেরা ভারতবর্ষে আসা যাওয়া করিত। তখন হইতে সপ্তগ্রাম বঙ্গের একটি

অতি প্রধান বাণিজ্য স্থান বলিয়া কথিত। আইন-আক্‌বরিতে একটি বন্দর বলিয়া ইহার উল্লেখ। পুরাকালে ইহা যে বঙ্গের কেবল একটি বন্দর ছিল এমন নহে, কোন কোন হিন্দু রাজা এবং মুষলমান সুবেদারের রাজধানীও ছিল।

ষোড়শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সপ্তগ্রামের অধঃপতন আরম্ভ হয়। গঙ্গার প্রধান ধারা সরস্বতী দিয়া সপ্তগ্রাম হইয়া দক্ষিণে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইত। এই সময় উহার পরিবর্ত্তন হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রা হুগলি নদী প্রবাহে তাহা মিশিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত-দেহা করত সুন্দরবন সান্নিধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। সুরধুনী গঙ্গার সলিল পোষণ না পাইয়া সরস্বতী শীর্ণা হইয়া পড়েন এবং পূর্ব্ববৎ পোতাদিকে বক্ষে ধারণে অসমর্থা হইয়া উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন।

এই সময়ে হুগলি একটী বন্দর হইয়া উঠে এবং তদ্দৃষ্টে বাণিজ্য-লক্ষ্মী সপ্তগ্রাম পরিত্যাগে হুগলি আসিয়া স্বীয় আসন বিস্তার করেন। সকলেই লক্ষ্মীর অনুসরণ করিয়া থাকে, সকলেই

"লক্ষ্মীর বর-যাত্রী", তাই বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য লোকও সপ্তগ্রামকে পশ্চাৎ করেন এবং পতিপুত্র, সহায়সম্পত্তিহীনা নিঃস্ব হিন্দু বিধবার ন্যায় সপ্তগ্রামের দশা হয়।

পূর্ব্বকালের সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে কবিকঙ্কণের কয়েকটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ঃ—

"সপ্তগ্রামের বণিক্ কোথায় না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্তঋষির শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥"

সপ্তগ্রাম একটি পরম পুণ্যতীর্থ ছিল, এটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধন-ধর্ম্মের একত্র অবস্থান অতি বিরল। আর লোকের স্বভাব চরিত্র ও ধর্ম্ম-গুণে স্থানের মাহাত্ম্য ও গৌরব। সপ্তগ্রামের বণিক্‌রা যে ধর্ম্মিষ্ঠ ও পুণ্যাত্মা ছিলেন উল্লিখিত পদ্যে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—কাব্য ১৫৭৩ এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ আজ হইতে ৩২৫।৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। সুবর্ণ বণিক্‌রাই বঙ্গের বৈশ্য। বল্লালের অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত

সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগে বঙ্গের অন্যান্য স্থান-মধ্যে তাঁহারা সপ্তগ্রামে চলিয়া আইসেন। তৎকালে সপ্তগ্রাম বণিক্‌প্রধান স্থান ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সময়ে বণিক্‌গণ তথায় ছিলেন। সুবর্ণবণিক্‌গণও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। তৎকালে এই বণিক্‌দিগের তথায় অবস্থানও ঐতিহাসিক কথা। চক্রবর্ত্তী মহাশয় সপ্ত-গ্রামের পুণ্যকীর্ত্তনে তন্নগরবাসী বণিক্‌দের (ঐ সঙ্গে সুবর্ণবণিক্‌দেরও) পুণ্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সপ্তগ্রামের পূর্ব্ব কীর্ত্তির প্রায় কিছুই নাই। ইহার একটি অত্যুৎকৃষ্ট মস্‌জিদের কথা মৃত ব্লক্‌-মান সাহেব বলিয়াছেন। অন্যান্য কীর্ত্তিসহ কাল-স্রোতে তাহারও সকলি ভাসিয়া গিয়াছে। একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাংশ, গজ্‌গিরি করা একটি পুকুর, কয়েকটী পাথরের কর্ব্বর এবং কয়েকখানি কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ড, একটী প্রাচীন লোক যাত্রীদের মধ্যে মধ্যে দেখাইয়া থাকে। এই পাথরগুলির উপর আর্‌বী অক্ষরে কতকগুলি সুন্দর ধর্ম্মো-পদেশ বাক্য ক্ষোদিত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনুমান ১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন গৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের তিনটি প্রধান রাজধানী ছিল,—গৌড়, সুবর্ণগ্রাম এবং নবদ্বীপ। সুবর্ণগ্রামে সুবর্ণবণিকেরা বাস করিতেন। তাঁহাদের নেতা—বল্লভানন্দ আঢ্য-সহ টাকাকড়ির লেন্‌দেন লইয়া বল্লালের "মন-কসাকসি" ঘটে। মহাসমারোহে পুত্রেষ্টি করিয়া বল্লাল সকল জাতিকেই আহ্বান করিয়া পান-ভোজন করাইয়াছিলেন। সুবর্ণ বণিকেরাও আহূত হইয়া রাজবাটীতে আইসেন; কিন্তু ভোজন গৃহে তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে "ছোঁয়াছুঁয়ি" হইতেছে দেখিয়া তাঁহারা অভুক্ত চলিয়া যান। এই কথা বল্লালের প্রিয় পাত্র ভীমসেন তাঁহার কর্ণগোচর করিলে বল্লভানন্দ আঢ্যের পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া তিনি রাগান্ধ এবং ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া সমগ্র সুবর্ণ বণিক্-জাতি, আজি হইতে শূদ্র এবং তাহাদের

যজ্ঞোপবীত ধারণ বৃথা, এই আদেশ ঢেঁড়া পিটাইয়া হাটবাজার পথ ঘাট সর্ব্বত্র প্রচার করাইয়া দেন।

সুবর্ণ বণিক্‌দের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভীরু ও সমুচিত তেজস্বী ছিলেন। ধর্ম্মহানির ভয়ে তাঁহারা বল্লালের অধিকার ছাড়িয়া ধন সম্পত্তি এবং পরিবার সহ মানগড়, তমলুক্ প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আইসেন। এই ঘটনার সময় বাণিজ্য লক্ষ্মীর আসন সপ্তগ্রামে সুদৃঢ় সংস্থাপিত ছিল। সুবর্ণগ্রাম হইতে বহুতর সুবর্ণ বণিক্ সপ্তগ্রামে আসিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া দিনপাত করিতে থাকেন।

ঢাকায় সুবর্ণগ্রামে সুবর্ণ বণিক্‌দের অধঃপতন হয়। অমর্ষণ, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া বল্লাল ইহাদের যজ্ঞসূত্র কাড়িয়া লন। আমি দেখিয়াছি, ঢাকাস্থ সুবর্ণ বণিক্‌দের প্রতি তথাকার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য,কায়স্থ জাতির যেরূপ বিষদৃষ্টি, অন্য কোন স্থানের সুবর্ণবণিক্‌দের প্রতি সেই সকল স্থানের কায়স্থ ব্রাহ্মণদের সেরূপ নহে। বল্লাল কর্ত্তৃক এবং তদ্ধেতু অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক

নিগৃহীত হইয়া অপমান সহ্য করত যে সকল সুবর্ণ বণিক্ ঢাকায়—সুবর্ণগ্রামেই অবস্থিতি করিতে থাকেন, বর্ত্তমান ঢাকাস্থ সুবর্ণ বণিক্‌গণ যে তাঁহাদেরই বংশ, এই রূপ অনুমান হয়। ঢাকায় সুবর্ণবণিক্‌দের মধ্যে বেশ বীর্য্যশালী তেজস্বী পুরুষ বড় কম, এই রূপ অনেকেরই বোধ। এরূপ হওয়াও বিচিত্র নহে। ৮০০। ৯০০ বৎসর ধরিয়া পদপেষিত হইলে কাহার না মানসম্ভ্রম-জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, পুরুষার্থ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় ?

সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ্ অনেক কথা বলিয়াছেন। তৎসমুদয় একান্ত হেয় এবং অসার। ঢাকা প্রদেশস্থ অতীব দুঃখী, সামান্য সুবর্ণবণিক্ সম্বন্ধেই তাহা প্রয়োগ হইতে পারে। চুচূড়া, হুগলী, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর, কলিকাতার সুবর্ণবণিক্‌দের সম্বন্ধে তাহা একেবারে প্রয়োগের অযোগ্য। বলা বাহুল্য ডাক্তার ওয়াইজ্ তাঁহার জীবনের অনেকটা ঢাকা প্রদেশেই অতিবাহিত করেন। উল্লিখিত স্থান সমূহের সুবর্ণবণিক্‌দের সংসর্গে আসিলে, সমস্ত

সুবর্ণ বণিক্ জাতি সম্বন্ধে তিনি উক্ত রূপ অমূলক অসার কথা বোধ হয় বলিতেন না।

ঢাকা—সুবর্ণগ্রামের সুবর্ণবণিক্ এবং এ অঞ্চলের সুবর্ণবণিক্‌দের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাহার প্রধান কারণ, নীলাচল হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর গৌড়ে আগমন এবং বঙ্গদেশে গমন না করা। বল্লালের অত্যাচারে বহুতর সুবর্ণবণিক্ সুবর্ণগ্রাম ত্যাগে সপ্তগ্রাম এবং কর্জ্জনাতে আসিয়া পরিবার সহ বসবাস এবং বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে থাকেন। ইহার কয়েক শত বৎসর পরে প্রেম-ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সময়ে যাহা ঘটে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত আদি বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহা আমাদের বলিতেছেন ঃ—

চৈতন্য আদেশ পেয়ে, নিতাই বিদায় হয়ে,
আইলেন শ্রীগৌর মণ্ডলে।
পানিহাটি গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সহ মিলে। ইত্যাদি
জাহ্নবীর দুই কূলে আছে যত গ্রাম।
সর্ব্বত্র ফিরেন নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥

পরে সপ্তগ্রামে হয় প্রভুর আগমন।
বিস্তার বর্ণিয়াছে ইহা দাসবৃন্দাবন॥

এই সমস্ত পদ্যে প্রকাশ, নিত্যানন্দ রায় বল্লাল অধিকৃত সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা অঞ্চলে সমুদিত হন নাই। মহাপ্রভুর আদেশে তিনি গৌড়েই সমুদিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যারসে বিহরেন লই শিষ্যগণ॥
তবে কত দিনে ইচ্ছাময় ভগবান্।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান্॥
তবে প্রভু কথো আপ্ত শিষ্যবর্গ লয়্যা।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হয়্যা॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

সন্ন্যাসগ্রহণের বহুপূর্ব্বে শিষ্যগণ সহ নিমাই-চাঁদ বঙ্গদেশে গমন করিয়াছিলেন। প্রেম-ভক্তি-দানে দুঃখী, পতিতের উদ্ধারের জন্য তিনি তথায় যান নাই। শ্রীপুরুষোত্তম ধামে অবস্থিতি কালে তিনি একদিন নিত্যানন্দ স্বরূপকে বলেন ঃ—

"এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন॥

ইত্যাদি, শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড।

পতিতোদ্ধারের ভার তিনি নিত্যানন্দ রায় প্রতি অর্পণ করেন।

আর কি জন্য মাত্র গৌড়-দেশে যাইবার নিমিত্ত শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ স্বরূপকে আদেশ করেন তাহা তিনিই জানিতেন। ভগবানের লীলা-খেলা মানব বুদ্ধির অগোচর।

বঙ্গদেশ-বাসীরা কি ভাবে গৌরসুন্দরকে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্ন পদ্যগুলিতে প্রকাশ ঃ—

"পদ্মাবতীতীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্ব লোক বড় হইল আনন্দ॥
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
আসিয়া আছেন সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি॥
সভে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা করি অতি পরিহার॥

আমা সভাকার মহা ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে ॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনি ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সভার দুয়ারে ॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥
সবে এক নিবেদন করি যে তোমারে।
বিদ্যা দান কর কিছু আমা সভাকারে ॥
ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, আদিখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

"হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ ॥
মহাবিদ্যা-গোষ্ঠি প্রভু করিলেন বঙ্গে।
পদ্মাবতী দেখি প্রভু ভুলিলেন রঙ্গে ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি, কে পড়য়ে কোন্ ঠাঁই ॥
এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গ-দেশে করিলেন স্থিতি ॥

ইত্যাদি, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, আদিখণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

দেখা যায় বঙ্গ-দেশ-বাসীরা মিশ্রসুত শ্রীকৃষ্ণ-

চৈতন্যদেবকে "নিমাইপণ্ডিত" বলিয়াই গ্রহণ এবং মহাপ্রভুও তথায় এক "মহা বিদ্যা-গোষ্ঠী" সৃজন করেন। লক্ষ্মীদেবীর "তিরোভাব" হইলে তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাগত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধর্ম্মহানির ভয়ে অনেক সুবর্ণবণিক্ সুবর্ণ-গ্রাম ও বল্লালের অধিকার ত্যাগে, সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্য-আকৃষ্ট হইয়া তথায় চলিয়া আইসেন। এদেশস্থ বর্ত্তমান সুবর্ণবণিক্-গণ তাঁহাদেরই সন্তান। কিন্তু কিজন্য তাঁহারা অনুপনীত, তৎসম্বন্ধে বদনগঞ্জ নিবাসী মৃত হারাধন দত্ত মহাশয়, যাহা বলিয়া এবং লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্ভবপর, অসমী-চীন নহে।

হারাধন দত্ত মহাশয় এ অঞ্চলের বৈষ্ণব সংসারে অপরিচিত ছিলেন না। তিনি উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি বংশধর। পরম্পরাগত কিম্বদন্তীর অনুবর্ত্তনে তিনি বলিয়াছেন :—

সপ্তগ্রামবাসী সুবর্ণবণিক্গণ বৈদিক বিধি

অনুসারে উপবীত ধারণ করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিন নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ—"উদ্ধারণ! তুমি পদ্মপুরাণাদি দেখিয়াছ? দত্ত "না "বলিলে, নিত্যানন্দ প্রভু নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ—

—"কৃষ্ণমন্ত্রপ্রবেশেন মায়াদেহস্য নাশতঃ।
কৃপয়া গুরুদেবস্য দ্বিতীয়ো জন্ম কথ্যতে॥
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবং॥"

যে জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ মন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আবার পৈতা কেন? তুলসী মালাই কৃষ্ণ-ভক্তের পক্ষে যথেষ্ট। জাত্যভিমানের চিহ্ন স্বরূপ উপবীতধারণ তাঁহার অকর্ত্তব্য। ইহার পর জ্ঞাতিবর্গ সহ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর উপবীত পরিত্যাগ করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে "কৃষ্ণনাম" "হরিনাম" "তুলসী-মালা" প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। "হরিণাম" "কৃষ্ণনাম" গুণে, তুলসী-মালা ধারণে, বৈষ্ণবের প্রকৃত নর জীবন হয়। কাজেই যজ্ঞোপবীত সামান্য সূত্র-

বলিয়া তাঁহার বোধ হওয়া বিচিত্র নহে। আর যে সে নয়, স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু যখন ঐ বিষয় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন (এবং বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, কাকে ? শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ বৈষ্ণবকুলতিলক, ভক্ত-প্রবর, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে) তখন ঐরূপ ঘটনা ঘটা আশ্চর্য্য নহে। তৎসময়ের সুবর্ণবণিক্ সমাজের নেতা সপ্তগ্রামবাসী সাধুশ্রেষ্ঠ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের কার্য্য যে তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এবং অন্যান্য সুবর্ণবণিক্ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল, তাহাও সম্ভবপর। সুবর্ণবণিক্গণ সাধারণতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দভক্ত, বিশেষতঃ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সময় হইতে তাঁহারা নিত্যানন্দ প্রভুর একরূপ কৃতদাস। সেই প্রভুর আদেশেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উপবীত বর্জ্জন করেন। বোধ হয় তদ্ধেতুই তাঁহাদের বংশধরেরা এইক্ষণ অনুপনীত।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এবং তৎসঙ্গে সপ্তগ্রামস্থ অন্যান্য সুবর্ণবণিক্গণ, যজ্ঞ-সূত্র স্থলে তুলসীমালাধারণ, গায়ত্রী স্থলে "হরি-," "কৃষ্ণনাম" জপনই প্রশস্ত বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহাদের বংশধর, সন্তানগণের সেইরূপ বুঝা ও সেইরূপ করাই উচিত। প্রেমভক্তিপ্রণোদিত হইয়া শুদ্ধসরলচিত্তে তুলসী-মালা ধারণে "কৃষ্ণনাম" "হরিনাম" করণে বৈশ্যত্বের কথা দূরে থাকুক্, সুবর্ণবণিক্‌গণ দেবত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। ঐরূপ করায় উদ্ধারণ দত্ত "ঠাকুর" হইয়াছিলেন এবং "ঠাকুর" বলিয়া তিনি বৈষ্ণবজগতে প্রসিদ্ধ।

এই স্থানে এতদুপলক্ষে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক :—

"বল্লালের অত্যাচারে বণিক্ সমস্ত।
নানা স্থানে সকলে যাইতে হইল ব্যস্ত ॥
কেহ গেল দক্ষিণে কেহ গেল রাঢ় দেশে।
কেহবা কর্জ্জনায় বাস করিলেন শেষে ॥
কেহবা মিথিলা গেল শাস্ত্র অধ্যয়নে।
কেহবা গুজরাটে গেল বাণিজ্য কারণে ॥
কেহবা উত্তরে গেলা কেহ রৈলা বঙ্গে।
পরস্পর নাহি দেখা স্বজনের সঙ্গে ॥
সোণার সুবর্ণগ্রাম শ্রীহীন হইল।
দুই চারি ঘর মাত্র স্বস্থানে রহিল ॥"

কুলজি।

দুই চারি ঘর ভিন্ন সমস্ত সুবর্ণবণিক্ সুবর্ণ-গ্রাম পরিত্যাগে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। বল্লালের অত্যাচারই সুবর্ণ-বণিক্গণের স্বগ্রাম (সুবর্ণগ্রাম) পরিত্যাগের কারণ। যাঁহারা গুজরাট প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও যজ্ঞো-পবীত ধারণ করেন এবং প্রাচীন বৈশ্যাচারসম্পন্ন। এ অঞ্চলের সুবর্ণবণিক্দের যজ্ঞসূত্র নাই বটে, কিন্তু বৈশ্যের কোন কোন আচার তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যমান। দেখা যায় যে সাবিত্রী-সূত্র ধারণ ভিন্ন আজ কালের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা একান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। কালহস্তে অনেক পুরাতন জিনিস্ নষ্ট, কালগর্ভে অনেক নূতন জিনিস্ প্রসূত হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা বলিবার অগ্রে একটি বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক। "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর গন্ধবণিক্, তাঁহার নিবাস কাটোয়ার উত্তর গঙ্গাতীর সন্নিহিত উদ্ধারণ পুর।" পণ্ডিত প্রবর ৺মদনগোপাল গোস্বামীকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের ১৮১৩ শকাব্দের সংস্করণে উক্ত কথাগুলি

"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

পদ্যের নীচে টিপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এই বিষয়টির অবতারণা এবং তাহার আলোচনা।

সুবর্ণ বণিক্‌দের ন্যায় গন্ধবণিক্‌দেরও দত্ত পদবী আছে এবং কাটোয়া ও তন্নিকটস্থ উদ্ধারণ পুরে, কয়েক ঘর গন্ধবণিকের বাস; মাত্র এই দুইটি বিষয়ের উপর গন্ধবণিক্‌দের দাবি খাড়া

হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করা আবশ্যক। এই প্রমাণ দুইটি একান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং নিরবলম্ব।

দত্ত ঠাকুর যে সুবর্ণবণিক্, তিনি যে সপ্তগ্রামে বাস করিতেন এবং তিনি যে সপ্তগ্রামবাসী ছিলেন, ইহার প্রমাণ দুই একটি নয় অনেক এবং অকাট্য। তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) হুগলি-বালী নিবাসী সুবর্ণবণিক্ জগমোহন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের একটি দারুময় প্রতিমূর্ত্তি আছে। অন্যান্য বিগ্রহ সহ তাহার প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। হুগলি-বালীর দত্তেরা বলেন, যে মূর্ত্তিটি তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের।

হুগলি-বালী এবং সপ্তগ্রাম পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থান। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বাণিজ্য বিলোপে সপ্তগ্রাম হইতে সুবর্ণবণিক্গণ হুগলি, হালিসহর, চুঁচূড়া প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আইসেন। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের বংশের বিলোপ হয় নাই। তাঁহার কোন না কোন

বংশধর হুগলি-বালীতে অবশ্য আসিয়াছিলেন। হুগলি-বালীর দত্ত মহাশয়েরা আমার মাতৃ-দেবীর মাতামহবংশীয়।

হারাধন দত্ত মহাশয়ের নামের ইত্যগ্রে উল্লেখ হইয়াছে। তিনি বলিতেন, ১৪৫৩ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ঈশ্বরে নশ্বর দেহ সমর্পণ করেন। সেই দিনটি তাঁহাদের শোকের দিন এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনে তাঁহাদের পিতৃকৃত্য করিতে হয়।

(২) নরহরি চক্রবর্ত্তী কৃত প্রাচীন ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

"হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সপ্তগ্রামে।
নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হয়ে প্রেমে॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণ দত্তের আলয়।
করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে এই হয়॥
প্রভুর বিচ্ছেদ দুঃখে দগ্ধি অনুক্ষণ।
এই কত দিন হৈল হৈলা সংগোপন॥
তার অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার।
শুনি নরোত্তম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥"

যে কেহ নয়, সাধুপুঙ্গব, ভক্তশীর্ষ এবং

বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রভু নরোত্তম দাস উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সপ্তগ্রামেই অনুসরণ করেন। তথায় তাঁহার আবাস না হইলে দাসপ্রভু কখন এরূপ করিতেন না। ভক্তিরত্নখনির স্বামী চক্রবর্ত্তী কবি বলিয়াছেন, সপ্তগ্রাম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের। প্রেমবিহ্বলচিত্তে প্রভুনরোত্তমদাস সপ্তগ্রামে প্রবেশ করিয়া তথায় কোথায় তাঁহার আলয়, গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। দত্ত ঠাকুর সপ্তগ্রামবাসী না হইলে তন্নাগরিকেরা দাসপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে কাঁদিয়া এমন কথা কখনই বলিতেন না "যে অল্পদিন হইল তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে, তাঁহার চির বিচ্ছেদ-অগ্নিতে আমরা নিয়ত দগ্ধ হইতেছি, তাঁহার "অপ্রকট" অপ্রকাশে সপ্তগ্রাম অন্ধকারময় হইয়াছে।"

(৩) চৈতন্য ভাগবতকার বলিয়াছেন :—

" কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্ব্বগণ সহে ॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥"

পূর্ব্বকালে ত্রিবেণী এবং সপ্তগ্রাম একই অথবা

দুটী "পাশাপাশি" জনপদ এবং তাহাতে দত্ত ঠাকু-রের মন্দির অর্থাৎ বাড়ী ছিল।

(৪) ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তার গ্রন্থোক্ত :—

"তারা কহে এ বৈষ্ণব হয় কোন্ জাতি।
পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নামে কোথায় বসতি॥
প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি ইহার।
সুবর্ণবণিক্ দেখি করিনু স্বীকার॥"

পদ্য গুলি দ্বারা প্রকাশ যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ত্রিবেণীতেই (সপ্তগ্রাম) বাস করিতেন; অপিচ তিনি অন্য কোন বণিক্ নহেন, সুবর্ণবণিক্ই ছিলেন।

৬। কৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ-বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বর্ণনে বলিয়াছেন :—

"মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥

এই পদ্যটীর নীচে মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় টিপ্পনী করিয়াছেন—

"উদ্ধারণ দত্তও (শ্রীকৃষ্ণের) দ্বাদশ সখার এক সখা। হুগলি জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ইঁহার বাস। ইনি সুবর্ণবণিক্কুলশিরোমণি।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উপর সুবর্ণবণিক্ জাতির দাবি সংস্থাপনের জন্য বোধ হয়, আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক।

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছে "উদ্ধারণ দত্ত, উদ্ধারণপুর," এটি ভুল। যাহাতে উক্ত পঞ্জিকায় এ ভুলটি না থাকে, তৎপক্ষে সুবর্ণবণিক্দের যত্ন করা উচিত। ভুলটি এইরূপে সংশোধিত হওয়া কর্ত্তব্য :—

দ্বাদশ গোপালের পাট। উদ্ধারণ দত্ত, সপ্তগ্রাম।

অষ্টম অধ্যায়।

কবিকর্ণপূর প্রণীত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ১২৯ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম পাদে উক্ত হইয়াছে :—

"সুবাহুর্যোব্রজে গোপা দত্তউদ্ধারণাখ্যকঃ।"

ব্রজে যিনি সুবাহু নামক গোপ কিনা গোপাল ছিলেন, তিনিই উদ্ধারণ দত্ত। তিনি যে সে ব্যক্তি ছিলেন না। ব্রজলীলায় সুবাহু গোপাল নামে

নন্দতনুজ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সহ লীলা খেলা করিয়া তিরোভূত হয়েন। পরে কলিতে সুবর্ণবণিক্‌কুলে সমুদ্ভূত হইয়া উদ্ধারণ দত্ত নাম ধারণ করত নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবায় দিনযাপন করিয়া নশ্বর দেহ ভগবান্‌পদে সমর্পণ করেন।

দেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণববন্দনায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্বতীর্থ॥"

বৈষ্ণব কবি দত্ত ঠাকুরের সাবধানে বন্দনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এটি কম্ কথা নয়। শাস্ত্র দেবতারই পূজার, বন্দনার আদেশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

কালা কৃষ্ণদাস আর উদ্ধারণ দত্ত।
দ্বাদশ গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব॥

চৈতন্য মঙ্গলের সূত্রখণ্ডের এই পদ্যটিতে দত্ত ঠাকুরের মহত্ত্ব কীর্ত্তিত। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে তিনি ব্রজধামে দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল ছিলেন।

"মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥"

চৈতন্য ভাগবতোক্ত এই পদ্যটি দ্বারা প্রকাশ যে দত্ত ঠাকুর মহাভাগবত ছিলেন।

"উদ্ধারণ দত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার॥
মহাবল করি যারে ভাগবতে কয়।
উদ্ধারণ সেই বস্তু জানিহ নিশ্চয়॥

এ গুলি বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকৃত বৈষ্ণববন্দনার পদ্য। ইহাতে প্রকাশ যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর উদার, মহাবৈষ্ণব এবং "মহাবল" ছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

একদিন নিত্যানন্দ প্রভাতে উঠিয়া।
অম্বিকা নগরে যায় ভৃত্য এক লইয়া॥
জাতিতে বণিক্ নাম উদ্ধারণ দত্ত।
প্রভু পারিষদ হন পরম মহত্ত্ব॥

এই কয়েকটি পদ্যে দত্ত ঠাকুর যে পরম ভাগ-বত এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ ছিলেন, ইহাই ব্যক্ত হইতেছে।

নবম অধ্যায়।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে আর দুই একটি অন্য কথার উল্লেখ এবং সাধ্যমত তাহার মীমাংসা করিয়া পরে তৎসম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা বলিব।

ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৩০৯ সালে প্রকাশিত সুবর্ণবণিক্ নামক পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে নিত্যানন্দ উদ্ধারণের প্রস্তুত পক্ব অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিতেন। "প্রভু নিত্যানন্দ কহিয়াছেন" ;—

"কি কহ নিত্যানন্দের জাতির পরিপাটী। (২)
উদ্ধারণ দত্ত সোণারবেণে যার ডেলে দেয় কাটি॥"(৩)

চৈতন্য ভাগবত।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত ঘাঁটিয়া পদ্যটি দেখিতে পাই নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যসরসীকমলবিহারী ষট্পদ চৈতন্য ভাগবতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ-কর্ত্তা অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, উহা চৈতন্য ভাগবতে নাই। ইতিপূর্ব্বের গবেষণাকুশল পণ্ডিত (Research

Scholar) ভাগবতকুমার গোস্বামী, এম. এ. মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলিয়াছিলেন, "শ্রীচৈতন্য ভাগবতে ঐ পদ্যটি তিনি দেখেন নাই। বৈষ্ণবসাহিত্যদর্শনবিষয়ক গ্রন্থাদি দেখিয়া শুনিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য ভাগবতকুমার গোস্বামী মহাশয় রিসার্চ্চ স্কলার নিয়োজিত ছিলেন।

উল্লিখিত পদ্যটির দ্বিতীয় পদে "সোণার বেণে" শব্দদ্বয় অতিরিক্ত সংযোজিত করা হইয়াছে। পয়ার ছন্দে ১৪টি অক্ষর থাকার নিয়ম। "সোণারবেণে" এই শব্দদ্বয় যোগে শ্লোকের দ্বিতীয় পদে ১৪টি স্থলে ১৯টি অক্ষর হইয়াছে। আর পদ্যটির দ্বারা উভয় নিত্যানন্দপ্রভু এবং উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরকে যেন তাঁহাদের জাতি ধরিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণ দত্তের পাক করা অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ধরিয়া লইলেই বা কি হইল? যতদূর বুঝা যায়, যৎকালে নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত, সন্ন্যাসী ছিলেন, দত্ত ঠাকুরের পাককরা অন্নব্যঞ্জন সময়ে সময়ে গ্রহণ করিতেন। অবধূত সন্ন্যাসীর জাতি ও জাতি-

বিচার নাই। এরূপ স্থলে দত্তের পাক করা অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণে তাঁহার বাধা ছিল না। অপিচ ইঁহাদের মধ্যে পরম পবিত্র আধ্যাত্মিক ভাব ও সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ সত্ত্বে শিষ্যের পাককরা অন্ন গুরুর খাইবার হয় ত কোন আপত্তি ছিল না। আর উদ্ধারণ দত্তের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন নিত্যানন্দ প্রভু খাইয়া ছিলেন বলিয়া সমস্ত সুবর্ণ-বণিক্‌জাতি যে বৈশ্য, এটি একান্ত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত।

"সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য" পুস্তকেও "ডালে কাটির" কথা আছে। কিন্তু তাহাতে কোন পদ্য উদ্ধৃত হয় নাই।

"শ্রীপাদের নিতিনিতি ভিক্ষা আয়োজন॥"

ইত্যাদি পদ্য শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে আছে,দ্বিতীয় পুস্তকের এই কথাও ঠিক্ নহে। তাহা ভাগবতে নাই তবে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশবিস্তার গ্রন্থে আছে। যাহা হউক ইহাতে সমস্ত সুবর্ণবণিক্-জাতির কি বিশেষ লাভ তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। "পরিবর্ত্ত রূপে যে পাকের কথা" এই গ্রন্থে আছে, তাহা কোন্ সময়ের বিবেচনা করিলে

দেখা যায় যে হাড়াই পণ্ডিতাত্মজ যখন অবধূত সন্ন্যাসী ছিলেন, তখনই এইরূপ হইত। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা দেবীর সহিত বিবাহের অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভু আবার গৃহী, সংসারী হওয়ার পর, এরূপ ব্যাপার যে আর কখন হইয়াছিল এমন প্রকাশ পায় না।

উল্লিখিত হারাধন দত্ত মহাশয় উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু "ডেলে কাঠির" উল্লেখ করেন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন—"প্রবাদ, যে একদিন নিত্যানন্দ প্রভু দত্ত ঠাকুরের বাটীতে অন্নভোজন করণান্তর ভাতের (ডালের নয়) কাঠিটি ঐস্থানে (পাটবাড়ীর যথায় মাধবী লতামণ্ডপ আছে) প্রোথিত করিয়াছিলেন।"

ভগবান্ কিম্বা মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যা তা একটা কথা বলিতে নাই। শাস্ত্র ও ইতিবৃত্তমূলক কথা অথবা যুক্তিসম্বদ্ধ প্রবাদ ভিন্ন অন্য কথা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলা উচিত।

নবম অধ্যায়।

হুগলি-বালীর দত্তদের বাড়ীতে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের যে একটি দারুময় প্রতিমূর্ত্তি আছে, আমার জ্ঞাতিখুড়া জষ্টিস্ দ্বারকানাথ মিত্রের সতীর্থ এবং হুগলি আদালতের জনৈক প্রখ্যাত উকিল, মৃত সূর্য্যকুমার ধর মহাশয় তাহা দর্শন করিয়া তাহার এক ফটোগ্রাফ্- ছবি তোলাইয়াছিলেন। সেই ছবির একখানি করিয়া এই পুস্তিকার প্রথমে সংযোজিত হইল।

দত্ত ঠাকুর ব্রজে সুবাহু গোপাল ছিলেন। তাঁহার যে প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ করা হইল, তৎপ্রতি একটু ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই যেন গোপালের মূর্ত্তি মনে হয়। এটি কম্ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মুখ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সর্ব্বাবয়ব কোমলতা-পরিপূর্ণ, পৌগণ্ড, সরল, মধুরভাবাপন্ন। ব্রজেন্দ্র পত্নী যশোদার নীলমণির ন্যায় মূর্ত্তিটি হাঁটু গাড়া। তাঁহার বাম হস্ত ভূমিতে সংস্থাপিত; দক্ষিণ বাহু তোলা ও বাম দিকে বক্ষের উপর প্রসারিত।

মুখখানি বালানন্দব্যঞ্জক ; চক্ষু দুটি বিস্ফারিত, প্রফুল্ল, জ্যোতির্ম্ময়। মূর্ত্তিটি দেবভাবময়, মানুষের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয় না। হস্ত ও গলদেশ তুলসীমালাশোভিত, প্রায় সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা। নাসিকার উপরি একটি সুদিব্য তিলক। ওষ্ঠাধরে যেন বালহাস্য লাগিয়া আছে। সাধারণতঃ এরূপ মূর্ত্তি দৃষ্টি-গোচর হয় না। না হইবারই কথা ; কেননা দত্ত ঠাকুর সামান্য মানুষ ছিলেন না। যখন তখন এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, ভগবান্ এবং তাঁহার প্রিয় ভৃত্য—পার্ষদেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হন না।

দশম অধ্যায়।

বিষ্ণুর পাদপদ্মই সুরধুনী গঙ্গার জন্ম-স্থান, রত্নাকর সাগর-গর্ভ হইতেই লক্ষ্মী সমুদ্ভূতা। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর একটি মহা রত্ন ছিলেন। আবার তিনি যেমন তেমন রত্ন ছিলেন না।

যে সামান্য রত্ন মানুষে গলায় পরে, তিনি সে রত্ন নন। তিনি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের রত্ন-নূপুরের একটি মহামূল্য, দুর্ল্লভ রত্ন। ব্রজলীলায় ব্রজে তিনি ব্রজেন্দ্র কুমারের সখা ছিলেন; কলিতে প্রেমভক্তি খেলায়, প্রেমভক্তি ব্যাপারে, গৌর-সুন্দরের পরমসুহৃদ্, অভিন্ন-হৃদয়, জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রাণারাম, চিরানন্দ নিত্যানন্দ স্বরূপের পরম সেবক, পরম ভক্ত, প্রিয় ভৃত্য এবং চিরানুগত পার্ষদ ছিলেন। প্রকৃত মহাপুরুষের আদর্শ, উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ের বিশেষ বংশ মর্য্যাদা—বংশগৌরব থাকাই সম্ভব।

শ্রীজয়দেব গোস্বামী তাঁহার গীত-গোবিন্দ কাব্যে একটি মহাত্মার কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি আর অন্য কেহ নন, কবি উমাপতি ধর। উমা-পতি ধর সুবর্ণগ্রামনিবাসী কাঞ্জিলাল ধরের পুত্র। উমাপতি ধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার একটি সমুজ্জ্বল রত্ন এবং তাঁহার অমাত্য স্বরূপ ছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ের অনেক তাম্রফলক উমাপতি ধরের নামাঙ্কিত। তিনি সরল, দ্রুত রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

কাঞ্জিলাল ধরের সহোদরা ভগবতী দেবী সহ ভবেশ দত্ত মহাশয়ের পরিণয় হয়। এই ভবেশ দত্ত উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ। ইহাঁর পুত্র কৃষ্ণ দত্ত। কৃষ্ণ দত্তের একটু বিশেষ উল্লেখ আবশ্যক।

বল্লালের অত্যাচারে ধর্ম্মভীরু তেজীয়ান্ আত্মগৌরববিশিষ্ট ভবেশ দত্ত, পত্নী ভগবতী দেবী সহ মিথিলায় চলিয়া যান। পরে লক্ষ্মণ সেন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলে, পুত্র উমাপতি ধর সহ মন্ত্রণা করিয়া ভগ্নী ভগবতী দেবীর নিকট মিথিলায় যাইবার জন্য কাঞ্জিলাল ধর উন্মনা হন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন ইহা জানিতে পারিয়া পিতাপুত্রকে শান্ত করত ভবেশ দত্তকে সুবর্ণগ্রামে লইয়া আসিবার কারণ দূত প্রেরণ করেন। দূতের হস্তে সেন নৃপতির পত্র পাইয়া ভবেশ দত্ত পুত্র কৃষ্ণ দত্তকে তাঁহার সন্নিধানে পাঠাইয়া দেন। কৃষ্ণ দত্ত প্রথমতঃ মাতুল গৃহে উপনীত; পরে রাজ-সাক্ষাতে যাইয়া তাঁহার সভায় বুধমণ্ডলীমধ্যে আসন প্রাপ্ত হন। রাজাজ্ঞায় গীতগোবিন্দের ব্যাখ্যা করণে আদিষ্ট

হইয়া তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণ পক্ষে, পরে শিব পক্ষে উক্ত কাব্যের ব্যাখ্যা করিয়া সেন মহারাজ এবং তাঁহার সভাস্থ সমস্ত পণ্ডিতকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ দত্ত কৃত গীতগোবিন্দের এই টীকার নাম 'গঙ্গা'। বৈষ্ণব-বুধমণ্ডলীতে গীতগোবিন্দের এই টীকা সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সকুল্য ভবেশ দত্ত মহাশয় একটি বীর পুরুষ ছিলেন। বল্লালের অত্যাচারে ধর্ম্মনাশ ভয়ে ঘরবাড়ী ও সোণার স্থবর্ণ-গ্রাম ছাড়িয়া পত্নীসহ মিথিলায় চলিয়া যান। তথা হইতে স্থবর্ণগ্রামে প্রত্যাগত হইবার জন্য স্বয়ং মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। ভবেশ দত্ত যেমন তেমন ব্যক্তি হইলে তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেন তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না। এই ভবেশ দত্তের শ্যালকপুত্র উমাপতি ধর কবি, সুলেখক, রাজসুহৃদ্ এবং সুধার্ম্মিক ছিলেন। এই সুপবিত্র ও সমুচ্চ কুলে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের উৎপত্তি, উজ্জ্বল বংশের সমুজ্জ্বল সন্তান।

"ব্রজেস্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠমধুব্রতৌ।
মুকুন্দবাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ॥"
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, ১৪০ শ্লোক।

ব্রজে যাঁহারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্ত নামে গৌরাঙ্গ দেবের গায়ক। এই মুকুন্দ দাস ঠাকুর স্বরচিত একটি গাথায় বলিয়াছেন;—"উদ্ধারণ দত্ত শ্রীকর দত্তের পুত্র। তাঁহার গর্ভ-ধারিণী জননীর নাম ভদ্রাবতী। তাঁহার গোত্র শাণ্ডিল্য এবং তিনি সুবর্ণ বণিক্। তিনি নিয়ত শ্রীরাধাকৃষ্ণপদ ধ্যান করিতেন, নিত্যানন্দ প্রভুর দাস ছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বীয় পদে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি ত্রিবেণীতে বাস করিতেন"। পদ সমুদ্র, ৩০৪১ সংখ্যক গাথার গদ্য।

দত্ত ঠাকুরের জনক জননীর নাম লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে এই স্থানে একটি কথা বলিবার বাসনা। কথাটি এইঃ—দত্ত ঠাকুরের পিতার নাম শ্রীকর এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। শ্রীকর, বিষ্ণু, নারায়ণের অন্যতম নাম এবং ভদ্রাবতী

মঙ্গলা কিম্বা শুভময়ী নারীকে বুঝায়। শ্রীকর এবং ভদ্রাবতীর তনয় যে পরম শুভালয়, মঙ্গল-ঘট হইবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

হয়ত ইংরাজিনবিস, ইংরাজি জীবনীপাঠক বলিবেন "দত্ত মহাশয়ের শৈশব, কৈশোর, প্রৌঢ়, যৌবন, বার্দ্ধক্যের এবং তাঁহার সাংসারিক শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যবসায়বাণিজ্য, গৃহস্থ-আশ্রম, দাম্পত্য ঘটিত কোন কথাই জানিবার উপায় নাই, তাঁহার জীবনী পাঠ নিষ্প্রয়োজন।" কেবল এই প্রকার পাঠকের জন্য এই পুস্তিকা লিখিত হইতেছে না। উদ্ধারণ দত্ত পরম সাধু, পরম ভাগবত ছিলেন। সাধু, ভাগবত সম্বন্ধে, ভগবৎপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা যাহা জানিতে চাহেন, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাহার বড় অপ্রতুল নাই। সাধ্যমত তাহাই বিবৃত করিব; আশা, শ্রীহরি-চরণ-সরোজের ষট্পদ শ্রীহরিদাসেরা তাহাতেই তৃপ্তি বোধ করিবেন।

একাদশ অধ্যায়।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

"উদ্ধারণ দত্ত মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার ॥"

আর নিত্যানন্দ প্রভুসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥"

নিত্যানন্দ প্রভু রাগ দ্বেষ, অভিমান শূন্য এবং পরমানন্দ ছিলেন এবং উদ্ধারণ দত্ত মহাশয় পরম বৈষ্ণব, উদারস্বভাব এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার অধিকারী ছিলেন। "নিত্যানন্দ" এ কথাটি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি প্রায় প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয় না। যার তার পরমেশ্বর পূজায়, সেবায় অধিকার নাই। ঈশ্বর সেবা, ঈশ্বর পূজা এবং তাঁহার সেবা পূজায় অধিকার, এ দুইএর মধ্যে অনেক প্রভেদ। যে ঈশ্বর পূজার অধিকারী, ঈশ্বরে যেন তাঁর স্বত্ব ও অধিকার আছে, এইরূপ অনুমান হয়। "নিত্যানন্দ"

ভগবান্ সেবায় দত্ত মহাশয়ের অধিকার ছিল। অধিকন্তু ভগবান্ "নিত্যানন্দ" দত্ত মহাশয়ের প্রভু ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ রায় পুরুষোত্তম ধাম হইতে সর্ব্ব প্রথম গৌড়-দেশে পানিহাটী (পেনেটি) তে উপস্থিত হন। পরে গৌড়ের অন্য আর কয়েকটি স্থানে অবস্থিতি করণান্তর পরিশেষে খড়দহ হইতে সর্ব্ব-গণ-সহ সপ্তগ্রামে গমন করেন। যে সময় তিনি সপ্তগ্রামে যান তখন সপ্তগ্রাম একটি মহা-সমৃদ্ধিশালী বহু-জনাকীর্ণ জনপদ ছিল। তিনি সপ্তগ্রাম—ত্রিবেণীর-ঘাটে সর্ব্ব-গণ-সহ স্নানাদি করিয়া উদ্ধারণ দত্তের "মন্দিরে" অর্থাৎ বাটীতে অবস্থিতি করেন, আর কোথায় যান নাই, এটি লক্ষ্যের বিষয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ—

"নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব্ববৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥"

"ভাগ্যবন্ত" এই কথাটির প্রতিও লক্ষ্য করা

উচিত। ভাগ্যবান্ এবং ভাগ্যবন্ত, একই অর্থ-বোধক। সাধারণতঃ ইহাতে ধনী অথবা ধনবানকে বুঝায়। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে যখন এই কথাটির প্রয়োগ হইয়াছে, তখনই ইহার সাধারণ অর্থ পরিহারে "ভাগ্যবন্তের" এই অর্থই পরিগ্রহ করিতে হইবে—যে পরমার্থ ধনে ধনী, যে ভগবদ্রূপ ধন লাভ করিয়াছে, সেইই ভাগ্যবন্ত, কি না ভাগবত।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের বাড়ীতে নিত্যানন্দ প্রভু অবস্থিতি করিতেন এবং দত্ত মহাশয় "কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে "অকৈতবে" অকপটে তাঁহার শ্রীচরণ ভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন। নিত্যানন্দ স্বরূপ যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুগে যুগে উদ্ধারণ দত্ত তাঁহার কিঙ্কর, ভৃত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দত্ত ঠাকুর কেবল নিজকে উদ্ধৃত, উত্তোলিত করিয়াছিলেন, এমন নয়, সমস্ত বণিক্ (সুবর্ণ বণিক্) জাতিকে উদ্ধৃত, উত্তোলিত, ও পবিত্র করেন। এই বিষয়টির আর একটু আলোচনা পরে করা যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

সপ্তগ্রাম হইতে অম্বিকা নগর যাইবার সময় উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভু সহ ভৃত্য রূপে গমন করেন। তথায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দ্বারে উপস্থিত হইলে পর, তিনি তাঁহাকেই তাঁহার অন্তঃপুর-মধ্যে পাঠাইয়া দেন এবং দত্ত মহাশয় স্বীয় প্রভুর আগমন বার্ত্তা গৃহস্বামী পণ্ডিতপ্রবরকে প্রদান করেন। এই উপলক্ষে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা সহ নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ হয়।

এই বিবাহ উপলক্ষে তাহার পূর্ব্ব কয়েক দিন উৎসবাদি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে এক দিন সমবেত ব্রাহ্মণগণ নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন "আপনাকে প্রত্যহ ভিক্ষার আয়োজন করিতে এবং তজ্জন্য বাহির হইতে হয়। আপনি কি নিজে আপনার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন, না তাহা পাক করিবার জন্য পাচকব্রাহ্মণ আছে?" উত্তরে তিনি বলেন "কখন কখন আমি নিজে পাক করি; না পারিলে উদ্ধারণ 'উত্তা-

রিয়া' রাখেন।" এই কথায় বিপ্রগণ বিস্মিত হইলে তিনি আবার বলেন:—"এই দত্তের ত্রিবেণীতে বাস; ইনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক্; এজন্য ইঁহার হাতের অন্নব্যঞ্জন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছি।"

কোন কোন সুবর্ণবণিক্‌সুত এই ব্যাপারটিকে বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ দৃষ্ট হয় না। সুবর্ণবণিক্ জাতির বৈশ্যত্ব স্থাপনপক্ষে এই ঘটনাটি যে একটি প্রমাণ, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। উদ্ধারণ দত্ত পরম বৈষ্ণব, পরম ভাগবত, সাধুপুঙ্গব, বিশুদ্ধতার প্রতিকৃতি, মহা সদাচারী ছিলেন, এ জন্যই নিত্যানন্দ স্বরূপ তাঁহার পাককরা অন্নব্যঞ্জন গ্রহণে দ্বিধা করেন নাই। ইহাঁরা উভয়ে "পরিবর্ত্তরূপে" অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া ভোজন করিতেন। আর এরূপ কখন হইত? যখন নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী ছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণদাস, রঘুনাথ পুরী, গঙ্গা-দাস, গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভৃতি বহুতর পার্ষদ-সত্ত্বেও যে উদ্ধারণ দত্ত তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী

ছিলেন এবং সচরাচর তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন এবং পরিভ্রমণ করিতেন, এটিও লক্ষ্যের বিষয়। দেখা গিয়াছে নিত্যানন্দ প্রভু যখন অম্বিকা নগরে গমন করেন কেবল দত্ত মহাশয়ই তাঁহার সমভি-ব্যাহারী ছিলেন। তথায় তাঁহার ভাবী শ্বশুর সূর্য্যদাস পণ্ডিতের অন্তঃপুরে তিনি উদ্ধারণ দত্ত-কেই পাঠাইয়া দেন এবং এই উপলক্ষে নিত্যানন্দ প্রভু সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা দেবীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। যত দূর বুঝা যায়, দেশ বিদেশ এবং তীর্থ পর্য্যটনে উদ্ধারণ দত্তই নিত্যানন্দ প্রভুর নিয়ত সহচর ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নিত্যানন্দ স্বরূপ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "সত্য ঞিহ ঈশ্বর"। এ হেন প্রভুর প্রিয় পার্ষদ এবং মনোমত সমভিব্যাহারী হওয়া অল্প ভাগ্যের বিষয় নহে। উদ্ধারণ দত্ত সেই ভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বস্তুতঃ "ভাগ্য-বন্ত" ছিলেন।

উদ্ধারণ দত্তের তিরোভাবসম্বাদে সাধুশীর্ষ, ভক্তপ্রবর নরোত্তম দাস অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। যে চক্ষু কেবল হরিনাম, কৃষ্ণ নামেই

"ঝরিত" তাহা উদ্ধারণ দত্তের তিরোভাবে "ঝরিয়া" ছিল। তিনি যে কিরূপ মহাপুরুষ, সাধু, ভাগবতদের কিরূপ আদরের ধন, আত্মজন ছিলেন, এই একটি ঘটনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কথিত "সুবর্ণ বণিক্" পুস্তকে দত্তঠাকুরকে "উদ্ধারণ" না বলিয়া "উদ্ধরণ" বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্, ইহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কতকটা অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। আমার জ্ঞাতিখুড়া মৃত সূর্য্যকুমার ধর মহাশয় দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা লেখেন। তিনি লিখিয়াছেন "শ্রীশ্রী৺উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর।" শ্রীচৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ-বিস্তার এবং আর আর প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে দত্ত ঠাকুরকে ("উদ্ধরণ" নয়) "উদ্ধারণ"ই বলা হইয়াছে। হরিচরণ মল্লিক মহাশয় তাঁহার

নিত্যানন্দ চরিতামৃতে ও মৃত ভূধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের সংস্করণে দত্ত ঠাকুরকে "উদ্ধারণ" বলিয়াছেন।

দত্ত ঠাকুর সুবর্ণ বণিক্‌কুল উদ্ধার করেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন :—

যতেক বণিক্‌কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥

এ তাবতা "উদ্ধারণ"ই বেশ সঙ্গত। আর সুপণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটু জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, "উদ্ধরণ" নয়, "উদ্ধারণ"ই ঠিক্।

এস্থানে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির নামের সহিত তাঁহার ভাবী কার্য্যের সামঞ্জস্য, মিল দেখা যায়। দত্ত ঠাকুরের নাম উদ্ধারণ এবং তিনি স্বজাতির উদ্ধার করিয়াছিলেন। শান্তনুরাজসুত গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম নাম ধারণ পূর্ব্বক কয়েকটি ভয়ানক কার্য্য করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

"বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম ভক্তি অধিকার॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক্ অধম মূর্খ যে কৈল উদ্ধার॥"

চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।

এই পদ্যের শেষ দুই ছত্রের অর্থ স্থির করা আবশ্যক। এই ছত্রদ্বয় ধরিয়া সুবর্ণবণিক্-বিদ্বেষীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যে তাঁহাদের নিজের পুঁথিতেই তাঁহারা অধম, মুর্খ এবং পতিত বলিয়া নিন্দিত।

"সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্বৃত্তির্নীচ সেবনং।
বর্জ্জয়েত্তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাং।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়,
বিংশতি শ্লোক।

অর্থাৎ সত্যাসত্যাত্মক বাণিজ্য, বিপ্র পরিত্যাগ করিবেন। বাণিজ্য ব্যবসায় শুদ্ধ সত্যে

চলে না, তাহা করিতে গেলে, মানুষ প্রায়ই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া থাকে; বণিক্, ব্যবসায়ী লোক, সচরাচর অনৃতবাদী, শাস্ত্র যেন এইরূপ আভাস দিতেছেন।

"প্রভু বলে শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বর চলহ তুমি গৌড় দেশ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম সুখে॥

* * * * *

মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবার মোচন॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়।

স্ববৃত্তি চালনায় বণিক্ অনৃত, কিনা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাই ধর্ম্মভ্রষ্ট, একরূপ পতিত; এজন্য শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে বেদময়, অসত্যশূন্য বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বণিক্ অর্থে স্বার্থপর, অনৃতের আশ্রয় গ্রহণকারী, ধর্ম্মভ্রষ্ট লোক, শ্রীচৈতন্য ভাগবতকারেরও অভিপ্রায় তাই। সেই বণিক্-কুলকে, সেই অধম পতিতদিগকে উদ্ধার করি-

বার জন্য, তাহাদের মোচনের নিমিত্তই শ্রীচৈতন্য দেবের বৈকুণ্ঠ হইতে ধরাধামে আগমন।

কি প্রকারে ঈশ্বরে, ভগবানে প্রেমভক্তি করিতে হয়, গৌরাঙ্গশ্রীহরি নিজে ভক্ত হইয়া তাহার উপদেশ দিয়া, তাহা লোককে শিখাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীচৈত্যন্য মহাপ্রভুর আদেশক্রমে প্রেমভক্তি বিতরণভার স্কন্ধে লইয়া শ্রীক্ষেত্র হইতে গৌড়ে আসিয়া প্রেমবন্যায় গৌড়-দেশ ভাসাইয়া স্বীয় প্রভুর কার্য্য করেন। শ্রীচৈতন্য দেবের অভ্যুদয়ের সময়ে সপ্তগ্রাম বিশাল বাণিজ্যের স্থান ছিল। কেবল সুবর্ণবণিক্ নয়, বহুতর অন্য বাণিজ্যব্যবসায়ীও তথায় তৎকালে বাস করিতেন। সেই সমস্তকে বৃন্দা-বন দাস ঠাকুর পতিত, অধম ও মূর্খ বলিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধার করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার আরও বলিয়াছেনঃ—

“যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে।”

নিত্যানন্দ প্রভু সকলকেই, সমস্ত জগতকে প্রেম ভক্তি দিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত পদ্যের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ ছত্রে তিনটি শব্দ দৃষ্ট হয়, বণিক্, অধম এবং মূর্খ। বণিক্ শব্দের সাধ্যমত ব্যাখ্যা করিয়াছি; অধম শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মতে অধম, নিকৃষ্ট, কিনা কৃষ্ণহীন, বিষয়কীট, প্রেমশূন্য লোক। ইহাদেরই প্রেমভক্তি দান করা আবশ্যক এবং ইহাদেরই তাহা দিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "তাঁহার দ্বিতীয় দেহ" নিত্যানন্দ স্বরূপকে পুরুষোত্তম হইতে গৌড়ে প্রেরণ করেন।

মূর্খ শব্দের অর্থ এখন বিবেচ্য।

"শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্দমোক্ষবিৎ॥
মূর্খো দেহাদ্যহম্বুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধ, ১৯ অধ্যায়, ৩৮।৩৯ শ্লোক।

দেহাদি অহং বুদ্ধি বিশিষ্ট জনই মূর্খ

* * * বস্তুতঃ ভগবচ্চিন্তা-বিহীন, বিষয় মাত্রে আসক্ত ব্যক্তিই মূর্খ। বণিক্, অধম এবং মূর্খের উদ্ধার জন্যই নিত্যানন্দ প্রভু গৌড়ে বৃহৎ বাণিজ্য স্থান,

বণিকাদির আবাসভূমি সপ্তগ্রামে সমুদিত হন।

স্বয়ং শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার "মূর্খ" শব্দের অর্থ যেরূপ করিয়াছেন তাহাও বলা যাইতেছে :—

"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতেরে প্রভু, করহ উদ্ধার ॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা ধনে কুলে,—তোমা জানিব কেমনে ॥

শ্রীচৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

এ উক্তিটি যার তার নয়, পণ্ডিতপ্রবর "সার্ব্বভৌম মহাশয়ের"। কথিত পদ্যে যে বিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে তাহা সদ্বিদ্যা নয়, অহং জ্ঞানের উৎপাদক যে বিদ্যা, সেই বিদ্যার কথাই এখানে বলা হইয়াছে। যে বিদ্যা ভগবান্‌কে জানিতে দেয় না, পণ্ডিতশূর "সার্ব্বভৌম মহাশয়" সেই বিদ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন। ফলতঃ তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন, যে বিদ্যা পাশস্বরূপ মানুষকে বন্ধন করে তাহা বিদ্যা নয়, মূর্খতা এবং এরূপ বিদ্যা বিশিষ্ট ব্যক্তি মূর্খ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনুমান ১৩৭০ শকে নিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হন। মৃত হারাধন দত্তের মতে দত্ত ঠাকুর ১৪০৩ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুবর্ণ বণিক্ এবং সপ্তগ্রামই তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার গোত্র শাণ্ডিল্য এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর দাস ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের ষট্পদ ছিলেন।

মুকুন্দ ঠাকুর ত্রেতায় গন্ধর্ব্ব নামে শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয় পরিকর এবং "কীর্ত্তনীয়া" সম্প্রদায়ের প্রধান গায়ক ছিলেন। তাঁহার একটি গাথায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

"উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, অতি শ্রেষ্ঠ, শান্ত, ধীর সুবর্ণবণিক্ ছিলেন। সর্ব্বদা রাধাকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করিতেন। বিষয় বাণিজ্য এবং সাংসারিক কার্য্য তুচ্ছ এবং তৎসমুদয় পুত্র শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করত বিবেকী হইয়া নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। গৌরভক্তগণ আপনাদের জনস্বরূপ তাঁহাকে পাইয়া তথায় যত্ন করিয়া রাখেন। সাধ-

কের যেমন উচিত, তিনি "আশাঝুলি" লইয়া ভিখারীর বেশে পুরীধামে "প্রসাদ" মাগিয়া খাইতেন।"

ভক্তদিক্‌দর্শনী অবলম্বনে হারাধন দত্ত মহাশয় আরও বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর ৪৮ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ৬ বৎসর নীলাচলে এবং ৬ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া ৬০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে অগ্রহায়ণের কৃষ্ণত্রয়োদশীতে নশ্বর দেহ ঈশ্বর পদে সমর্পণ করেন।"

সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবন ধামে তিনি দেহ রক্ষা করেন। হারাধন দত্ত মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবন ধামের "বংশীবটের" নিকট তাঁহার এক সমাধিমন্দির আছে। সপ্তগ্রামের পাট-বাড়ীতেও তাঁহার একটি সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ভক্ত, পরিকরের কেহ না কেহ, তাঁহার জন্ম ও বাসস্থানস্থিত তাঁহার ঠাকুর-বাড়ীতে তাঁহার পঞ্জর অথবা তাঁহার চিতাভস্ম আনিয়া কিম্বা আনাইয়া ভূগর্ভে রক্ষা করত তথায় তাঁহার এক সমাধিমন্দির করাইয়া ছিলেন।

কাল্‌না সন্নিহিত অম্বিকা নগরে দত্ত ঠাকুর কিছুকাল ছিলেন। কাটোয়া (কণ্টক-নগর) অম্বিকা কাল্‌না হইতে খুব বেশী দূর নয়। কাটোয়ার নিকট "উদ্ধারণপুর" নামে গঙ্গাতীরে একটি গ্রাম আছে। শুনা যায় এখানেও দত্ত ঠাকুরের একটি সমাধিমন্দির আছে। নদীয়া, কাল্‌না, কাটোয়া, অম্বিকাদি স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের পরম ধর্ম্মের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয়। দত্ত ঠাকুরের ন্যায় একটি ভাগবত, পরম বৈষ্ণব, সাধক-শীর্ষ, নিত্যানন্দদাস, গৌরভক্তের সমাধিমন্দির কাটোয়ার নিকট গঙ্গাতীরে থাকা বিচিত্র নহে।

দত্ত ঠাকুর যে কোন পুঁথি অথবা "পদ" রচনা করিয়াছিলেন, এমন প্রকাশ পায় না। হারাধন দত্ত মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, যে তাঁহার অনেক পুস্তক ছিল। তাঁহার কয়েকখানি তিনি পাইয়াছিলেন। দত্ত ঠাকুর ভক্তসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগ-বতপাঠ শ্রবণ করিতেন। শাস্ত্রপাঠে তিনি সবি-শেষ রত ছিলেন না। হরিনাম "সংখ্যা" করিয়া দিনপাত করিতেন। নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার চিত্র-পট প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টি করিলে বুঝা যায়, যে

তিনি হরিনামই সার করিয়াছিলেন। আর তদ্দৃষ্টে ইহাও বুঝা যায় যে, হরিনাম করার ফল যে পরমানন্দ তাহাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। সাধু সাধকের জীবনীপাঠে যাহা লাভ করিবার আশা করা যাইতে পারে, তাহা দত্ত ঠাকুরের জীবনের উপরি উক্ত কয়েকটী বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের পক্ষে এই লাভই পরম লাভ।

গৌরাঙ্গশ্রীহরির ধর্ম্মের প্রাণ প্রেমভক্তি এবং হরিনামকরণ; হরিনাম-সংকীর্ত্তন ইহার প্রধান অনুষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম আড়ম্বর শূন্য, সহজ; সাদা সিদা; অহংজ্ঞানহীন লোকের, সরল বিশ্বা-সীর এবং প্রেমের ধর্ম্ম। স্বয়ং নিমাই চাঁদের ন্যায় যে "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! কৃষ্ণ বিনে প্রাণ যায়, আমার কৃষ্ণকে আমায় আনিয়া দেও।" প্রাণের সহিত, অন্তরের সহিত, উন্মত্তের ন্যায় বলিতে পারে, সে সংসারমুক্ত, আনন্দময়, অকূল সাগরে কূল পায়; সে রাসবিহারীর লীলারস নিয়ত পান করে; সে বংশীধারীর অমৃতময় বংশীরব অন্তর-কর্ণে সর্ব্বদা শ্রবণ করত বিমোহিত এবং মন্ত্র-

মুগ্ধবৎ হয়; সংসারধ্বনি তাহার শ্রবণে প্রবেশ করিতে পারে না; বাসনানল তাহাকে দগ্ধ, অস্থির করে না; সে শান্তিসরিতের সুখসলিলে, আনন্দ-সমীরে নিয়ত সন্তরণ করে।

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের এই অতি উচ্চ পবিত্র অবস্থা হইয়াছিল। সেই অবস্থা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রাণ হওয়ার, নিত্যানন্দপদ সার করার ফল। এই অমৃতময় ফল লাভ করিয়া তিনি অমৃত হইয়াছিলেন এবং অমৃতধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনাকে মুক্ত, উদ্ধৃত করিয়াছিলেন এবং স্বজাতিসুবর্ণবণিক্-দিগকে সমুন্নত, ভগবদ্ভক্ত, কৃষ্ণ-প্রেমাসক্ত এবং নিত্যানন্দের অধিকারী করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট সুবর্ণবণিক্‌জাতি পরম ঋণে ঋণী; সুবর্ণবণিক্‌জাতি দত্ত ঠাকুরের একান্ত খাতক। মানুষের স্বভাব, তিনি নিজের পাওনার কথাই ভাবেন, ঋণের কথা প্রায়ই ভুলিয়া থাকেন। এই জন্যই তাহার দুরবস্থা, দুঃখ। নিত্যানন্দ প্রভু, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, সুবর্ণ-বণিক্‌জাতির যে কি মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না, যদি জানি ত স্মরণ করি না, ভাবি না। আমরা কি অকৃতজ্ঞ!

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত হ'ল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

এ কীর্ত্তনও দত্ত ঠাকুরকে লইয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ হরিসঙ্কীর্ত্তনের বিরোধী। তাহারা বলেন "হরিপূজার এ কি পদ্ধতি ? পথে পথে বেড়াইয়া চীৎকার করিয়া তাঁকে ডাকিবার প্রয়োজন কি ?" হরিভক্তশিরোমণি হরিদাস ঠাকুর ইহার উত্তর করিয়াছেন। হরিনদী গ্রামের দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন :—

"জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে ॥"

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য "হা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব! আমার প্রাণ মন চুরি

করিয়া কৃষ্ণ কোথা গেলেন," এই ভাবে এইরূপে কৃষ্ণকে ডাকিবার, খুঁজিবার, লাভ করিবার, উপদেশ করিয়াছেন। এই উপদেশই অতি গরিষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণকে ধরিবার এই প্রশস্ত পন্থা, প্রকৃষ্ট উপায়। প্রাণের আকুলতা, চিত্তের উন্মত্ততা, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মধু পান জন্য দারুণ পিপাসা ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণলাভ করা যায় না। এ সম্বন্ধে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেন যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রসাদ বলিয়াছেন :—

এমন দিন কি হবে আমার তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে,
আমার তারা বয়ে পড়বে ধারা॥
হৃদ্‌পদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হবো সারা॥

স্বয়ং নিমাই চাঁদের একটি কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। কথাটি এই :—

"প্রভু বোলে, শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
সন্ন্যাসী আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥

সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি।"
শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৩য় অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দত্ত ঠাকুরের সপ্তগ্রামের পাটবাড়ীর বিষ্ণু মন্দিরে ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুই প্রধান বিগ্রহ। দর্শনার্থী যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন, "মহা প্রভুর বাড়ী যাইতেছে।" বোধ হয় অনেকেই জানেন, এই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তিতে ত্রেতাবতার দাশরথি শ্রীরামচন্দ্রের দুটি, দ্বাপর যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণের দুটি এবং কলিযুগাবতার শচীদুলাল শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের দুটি হস্ত। বলা যাইতে পারে যে ভগবানের এই তিন প্রধান অবতার। লক্ষ্যের বিষয় যে ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র পতিতোদ্ধারক, প্রেমভক্তির অবতার শচীদুলাল নিমাইচাঁদের।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় দ্বিভুজ। নীলাচলে অবস্থিতি কালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রবোধ ও সন্তোষ জন্য শ্রীচৈতন্য

দেব ষড়্ভুজ হইয়া তাঁহাকে কৃপা করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, মধ্য লীলায় কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—

"আগে তাঁরে দেখাইলা চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশী মুখ স্বকীয় স্বরূপ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তির ছবি পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরের প্রাচীরে আছে; শ্রীমান্ অক্ষয় চন্দ্র সরকার আমাকে এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া তিনি সেই চিত্র দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন।

ষড়্ভুজ মহাপ্রভু মূর্ত্তিতে একটি বিশেষ তত্ত্ব থাকা বোধ হয়। মৎস্য, ভগবানের প্রথম অবতার। মীনশরীর ধারণ পূর্ব্বক ভগবান্ প্রলয় পয়োধি-জলমগ্ন বেদের উদ্ধার এবং আপাতশেষ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে তিনি পতিত উদ্ধার করেন। শ্রীরাম-চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কার্য্যও তাই; রাবণ ও কংসকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধার করা। গীতোক্ত ৪র্থ অধ্যায়ের

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

৮ম শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি গ্রহণ করি, যথা ঃ—সাধু (ভক্ত) সকলের উদ্ধার ও দুষ্কৃতের (দুরাচারের) বিনাশ, অপিচ শুদ্ধ ভক্তিযোগরূপ ধর্ম্ম সংস্থাপন ও প্রচার করিবার জন্য আমি যুগে যুগে আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি। বস্তুতঃ, সমস্ত উদ্ধার কার্য্যের সমাবেশ দেখাইবার জন্য উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর দ্বারা সংস্থাপিত পাটবাড়ীর শ্রীমন্দিরে ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর মূর্ত্তিটি অতি সঙ্গতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থানে স্মরণ করা উচিত যে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তিতে শ্রীচৈতন্য-দেব সার্ব্বভৌম মহাশয়েরও উদ্ধার করেন।

পাটবাড়ীর শ্রীমন্দিরে মহাপ্রভু ভিন্ন আর কয়েকটি বিগ্রহ আছে। আর আমার জ্ঞাতিখুড়া দত্ত ঠাকুরের দারুময় প্রতিমূর্ত্তির যে ফটোগ্রাফ্ ছবি লইয়া ছিলেন, বড় করিয়া সেইরূপ একখানি ছবি তথায় সংরক্ষিত হইয়াছে। এ কার্য্যটি অতি সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। এই ছবি দৃষ্টে যাত্রী ও দর্শকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দত্ত ঠাকুর সামান্য মানুষ নয়, দেবতা, ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রিয় বয়স্য সুবাহু গোপাল ছিলেন। যথাযথ রূপে ছবি

খানির প্রত্যহ পূজা এবং অন্যান্য ঠাকুরদের মত তাহারও নিত্য "ভোগরাগ" হইয়া থাকে।

বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন :—

"উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥"

নিত্যানন্দ প্রভু দত্তঠাকুরের "মন্দিরে" অর্থাৎ বাড়ীতেই থাকিতেন। বলা হইয়াছে তৎকালে সপ্তগ্রাম এবং ত্রিবেণী একই জনপদ ছিল। প্রবাদ, একদা নিত্যানন্দ প্রভুর নূপুর পাটবাড়ীর পুকুরে পড়িয়া যাইলে কোন আধ্যাত্মিক গভীর কারণে ভক্তবৃন্দ তাহা জল হইতে উদ্ধৃত করেন নাই। এই ঘটনাসূত্রে পাট বাড়ীস্থিত পুষ্করিণীটির নাম নূপুরকুণ্ড। গৌরভক্তের চক্ষে, নিত্যানন্দ স্বরূপের সেবকের নয়নে, এটি সামান্য জলাশয় নয়, শ্রীবৃন্দা-বনধামস্থ রাধাকুণ্ড কিম্বা শ্যামকুণ্ডের ন্যায় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দেখা গিয়াছে পাট-বাড়ীর যাত্রীদের অনেকেই ইহাতে স্নান করে এবং অন্নপ্রসাদ পাইয়া আঁচাইয়া থাকে। এই প্রকার কোনও কার্য্য নূপুর কুণ্ডে না হইতে দেওয়া উচিত।

আর একটি প্রবাদ এই :—একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে নিত্যানন্দ প্রভু ভাতের কাটিটি ঐ বাটীর উঠানে পুঁতিয়া দেন। কিছুদিন পরে তাহা একটি মাধবী লতাকার ধারণ করে এবং কালে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে পরিণত এবং পরিবর্দ্ধিত হয়। এই প্রকাণ্ড অসাধারণ মাধবী লতা আজিও বর্ত্তমান। ইহার পরমায়ু চারি শত বৎসর হইবে। লতাটি বিশেষ করিয়া দেখিলেও তাহাই বোধ হয়। ইহা এখন একটী বৃহৎ লতামণ্ডপ হইয়াছে। মূল হইতে লতা মণ্ডপের শিরোদেশ চার হাত উচ্চ হইবে। লতাটির বেড় ছয় হাতের কম নহে এবং ইহা অন্য কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া নাই। বৈষ্ণব পর্য্যটকদের মুখে শুনা যায়, এরূপ মাধবীলতা অন্য আর কোথাও তাঁহারা দেখেন নাই।

মাধবী মাধবপ্রিয়া, এজন্য শ্রীমাধব, শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসদিগের বড়ই হৃদ্য, মনোজ্ঞ। মাধবীলতা দেখিতেও বড় সুন্দর এবং ইহার ফুল যেমন মনো-হর, ফুলের গন্ধও তেমন মনোহারী। শ্রাবণ ভাদ্রে ইহা নব পল্লব পত্র পরিশোভিত এবং ইহার

পুষ্পোদ্গম হয়। সেইকালে মাধবী লতামণ্ডপের নীচে বসিলে দেহ মন শান্ত এবং পবিত্র সুখপূর্ণ হয়, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তদের হৃদয়ে রাধারমণ জিউর, বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণবল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের প্রাণারাম মূর্ত্তি উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত করে। ভগবদিচ্ছায় কথিত মাধবীলতা ও মণ্ডপটি চারি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া জীবিতনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর গরীয়ান্ গুণ গান করিতেছে। শ্রীহরিপ্রসাদে ইহা যে এইরূপ করিতে থাকিবে গৌরভক্ত নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ এরূপ আশা করিতে পারেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দত্ত ঠাকুরের সপ্তগ্রামস্থ শ্রীপাট দ্বাদশ পাটের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ পাট, বৈষ্ণবদিগের অতি সমাদরের স্থান; দুর্ভাগ্য বশতঃ ইদানীন্তন পাটবাড়ীর মহাপ্রভুর সেবাপূজার কোনও বিলি-বন্দবস্ত ছিল না, শ্রীমন্দির সমস্ত ভূমিসাৎ হইবার

উপক্রম এবং সপ্তগ্রামের মহা কীর্ত্তিটিও বিলুপ্ত হইতেছিল। আমরা চুঁচূড়া, হুগলি, বালিনিবাসী সুবর্ণবণিক্, আমাদের প্রায় চক্ষের উপর এই দুর্ঘটনা ঘটিতেছিল, আর আমরা নিশ্চিন্ত মনে, একান্ত উদাসীন ভাবে, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতে-ছিলাম। দত্ত ঠাকুর আমাদের প্রকৃত উদ্ধারকর্ত্তা, এটি একেবারে ভুলিয়া আমরা সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতেছিলাম।

স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন ঃ—

শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিযোগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥”

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৬শ অধ্যায়।

বৎসর ছয় হইল হুগলি নিবাসী সবজজ রায় বাহাদুর বলরাম মল্লিক বিশ্রাম আশায় পেন্‌সান্ লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে শ্রীহরির কৃপায় তাঁহার চিত্তে এক অপূর্ব্ব ইচ্ছার উদয় হইল। দত্ত ঠাকু-রের সপ্তগ্রামস্থ মহাকীর্ত্তিস্তম্ভ পতিত হইতেছিল। এ দৃশ্য তাঁহার অসহ্য হইল। তাহা রক্ষা করিবার

জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প, বদ্ধপরিকর হইলেন। আমরা দেখিয়াছি মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার চিত্তে দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট ভিন্ন, অন্য আর কিছুই স্থান পাইত না। তাহা তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার জপমালা হইয়াছিল। উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর এবং দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট তাঁহাকে উন্মত্ত প্রায় করিয়াছিল। পাটবাড়ীর জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তিনি এক দিবস আমার বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় এ সমস্ত বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ, একটু উন্মত্ততা আবশ্যক। প্রীতি ভক্ত্যাত্মক ধর্ম্ম প্রচার এবং সংস্থাপনের নিমিত্ত হরিনাম বিলাইয়া পতিতোদ্ধার করিবার কারণ স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

৪১৪ গৌরাব্দে বলরাম বাবুর যত্নে ও নেতৃত্বে হুগলি ঘুঁটিয়া বাজারস্থ রাধাবল্লভ জিউর ঠাকুর বাটীতে একটি সভা এবং তাহার ফল এই হয় যে চুঁচূড়া, চেতলা, হাওড়া, হুগলি, রামকৃষ্ণপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি ভাগবত সুবর্ণবণিক্ এবং তাহাদের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রাণা নিত্যানন্দ

সেবিকা কয়েকটী সুবর্ণবণিক্ মহিলা দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাটের গৌরব ও তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন।

শ্রীহরির কৃপায় কি না হয়। বালিবিন্দু পর্ব্বতে, বৃষ্টি-কণা সাগরে পরিণত হয়, বামন চাঁদ ধরিতে এবং পথের ভিখারী রাজ্যেশ্বর হইতে পারে। কথিত সভা হবার পর অল্প কাল মধ্যেই হুগলি ঘুঁটিয়া বাজারনিবাসী মৃত রাজবল্লভ শীলের পত্নী রাণীদাসী ১০২৫৲ টাকা ব্যয়ে মহাপ্রভুর অন্যতর শ্রীমন্দির, কলিকাতা খিদিরপুর নিবাসী বাবু বৃন্দাবন চন্দ্র দত্ত ১৪৭৫ টাকা ব্যয়ে নাটমন্দির এবং কলিকাতা চেতলা নিবাসী বাবু রাখাল দাস আঢ্য ১০৫০৲ টাকা ব্যয়ে নূপুর কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার, তাহার বাঁধাঘাট ও চাঁদনী নির্ম্মাণ করাইয়া এবং দত্ত ঠাকুরের সমাধিমন্দিরের সংস্কার করাইয়া দেন। মাধবী লতামণ্ডপের পিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হাবড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী বাবু হরিচরণ মল্লিকের মাতা ঠাকুরাণী ১৫০৲ টাকা ব্যয়ে তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার করাইয়া দেন। এই সমস্ত কার্য্য হওয়ার পর বাবু প্রসাদ দাস বড়ালের মাতা ঠাকুরাণী প্রায়

আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে মহাপ্রভুর সর্ব্ব প্রধান মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। ১৩০৯সালের পূর্ণিমার দোলের দিন উক্ত শ্রীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য অতি সমারোহে হইয়াছিল। আর ২৫০৲ টাকা ব্যয়ে বল-রাম বাবুর পত্নী স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম করিবার এবং প্রসাদ পাইবার ঘর বারাণ্ডা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন এবং ভোগমন্দির, ভাঁড়ার ঘর, পূজারী ও বৈষ্ণবদের ঘর, পুরুষদিগের বসিবার ঘর, চারি-দিকের প্রাচীর এবং ঠাকুরদের বাগানবাড়ী, শ্রীপাট সংস্করণ সমিতির ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। উপস্থিত অন্য কোন বিশেষ অভাব নাই। তবে পাঠবাড়ীর মেলা মহোৎসব শীতকালে হইয়া থাকে! সে সময় কোন কোন ভাগবত পরিবার সহ পাট-বাড়ীতে অবস্থিত করিবার ইচ্ছা করেন। ইহা-দের জন্য কয়েকখানি ঘর প্রস্তুত করাইতে পারিলে ভাল হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

এখন প্রায় ৬০৲ টাকা মাসিক চাঁদা আদায় হইয়া থাকে এবং তাহা ভাগবত সুবর্ণবণিক্‌গণই দিয়া থাকেন। কিন্তু চাঁদা দাতৃগণ যে চিরদিনই চাঁদা আদায় করিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। চাঁদা সংগ্রহ না হইলে মহাপ্রভুর সেবা পূজার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। আর পাটবাড়ীর জমির খাজানাদি আদায় পক্ষে যাহাতে কখন কোনও বিঘ্ন না ঘটে এবং শ্রীমন্দিরাদি যাহাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া না যায় তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। অন্ততঃ ত্রিশ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি মহাপ্রভুর নামে হইলে নিত্যানন্দ ভৃত্যগণ কথিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। সুবর্ণবণিক্‌গণ এখন আর কুবের সন্তান নন বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী। কলিকাতার দুই একটী শীল মল্লিক মনে করিলেই এই টাকা অনায়াসে দিতে পারেন। নিত্যানন্দ প্রভু, উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর, সুবর্ণ বণিক্‌দের উদ্ধার করিয়া গিয়া-

ছেন। ইঁহাদের নিকট স্বর্ণবণিকগণ ঋণাবদ্ধ। এই ঋণ পরিশোধ করিবার এই একটি সুযোগ। ইহা অবহেলা করা তাহাদের উচিত নয়!

স্বর্ণ বণিকজাতি সাধারণতঃ ধর্ম্মশীল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভাগবত, গৌরভক্ত, নিত্যানন্দ ভৃত্য। সপ্তগ্রামস্থ শ্রীপাট বজায় রাখিবার জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তাঁহাদের দ্বারস্থ হইলে যে একেবারে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।

বিংশ অধ্যায়।

অগ্রহায়ণী কৃষ্ণত্রয়োদশী দত্ত ঠাকুরের তিরোভাবের দিন; এই দিন পাঠ-বাড়ীতে মেলা মহোৎসব হয়। দত্ত ঠাকুর নিত্যানন্দ ভৃত্য ছিলেন। মাঘের শুক্ল ত্রয়োদশীতে পদ্মাবতীসুত নিত্যানন্দদেব অবতীর্ণ হন। এই দিনেও পাট-বাড়ীতে মহোৎসব হইলে ভাল হয়।

পদ সমুদ্রের ৪০১২ পদে নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে নরহরি দাস গাইয়াছিলেন ঃ—

“ভকতি রতন খনি, উঘারিয়া প্রেমমণি,
নিজ গুণ সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই, যাঁরে দেখে তাঁর ঠাঁই,
দান করে জগত বেড়িয়া॥”

হাড়াই পণ্ডিতাত্মজ নিত্যানন্দ রায় এইরূপ করিতেন। কিন্তু শ্রীপাটসংস্করণ সমিতির সভ্য ও অধ্যক্ষেরা সুবর্ণবণিক্ ভিন্ন প্রায় অন্য কাহাকেও কথিত উৎসবে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন না। জাতি নির্ব্বিশেষে যথাসাধ্য গৌর ভক্তগণকে নিত্যানন্দদাসদের আহ্বান করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমসূত্রে, ভক্তিডোরে সকলকে এক সমাজ সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তদেরও তাহাই করা সঙ্গত, তাঁহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করা বিধেয়। ইহাতে প্রেমের স্রোতঃ পরিবর্দ্ধিত, সদ্ভাবের অধিকতর সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা। গৌরভক্তবৃন্দের কোনরূপ অভিমান থাকা অনুচিত।

শ্রীপাট খড়দহের গোস্বামী প্রভুরা নিত্যানন্দ-

সন্তান। নিত্যানন্দ ভৃত্য উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাটবাড়ীতে মেলা মহোৎসবে ইঁহাদের এবং ঐ বংশীয় অন্যান্য গোস্বামী প্রভুদের ঐ সময়ে আহ্বান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং আবশ্যক। ইঁহা-দের পাদস্পর্শে পাটবাড়ী পবিত্র হইবার সম্ভাবনা।

একবিংশতি অধ্যায়।

বাবু বলরাম মল্লিক সপ্তগ্রাম শ্রীপাটের প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন। ১৩০৮ সালের পৌষে তিনি পরলোক গত হইয়াছেন। স্বীয় পার্থিব কার্য্য সমাধা করিয়া স্বস্থান নিত্যানন্দধামে গমন করিয়াছেন।

"দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইবে সেই সে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৫ম অধ্যায়।

"শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তাঁন ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥"

ঐ খণ্ড, ২৬শ অধ্যায়।

ভগবানই গড়িতেছেন এবং ভাঙ্গিতেছেন। বলরাম বাবুকে তিনিই আমাদের দিয়াছিলেন এবং তিনিই আপন নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার কাজ ফুলবাগানের মালীর ন্যায়। তিনি এই বিপুল বিশ্ববাগানের মালী। মালী যেমন বাগানের এক স্থানের একটি ফুলগাছ তাহার অন্য স্থানে লইয়া পোঁতেন, তিনিও তদ্রূপ এই ধরা হইতে মানুষকে অন্য লোকে লইয়া গিয়া তথায় রক্ষা করেন। কেন এরূপ করেন তাহা তিনিই জানেন। অবশ্য ভাগবতেরা বলিবেন, আমাদের মঙ্গল জন্যই। শ্রীহরি বলরাম বাবুকে আপন ধামে লইয়া গিয়া যেন আর কয়েকটি ভাগবতকে আমাদের দিয়াছেন। এই কয়েক ব্যক্তির সমষ্টিতে বোধ হয় বলরাম বাবু হইলেও হইতে পারে।

অন্যান্যের মধ্যে শ্রীপাটসংস্করণ সমিতির অন্যতর সম্পাদক বাবু কালীচরণ দত্ত শ্রীপাট তরণীর এখন প্রধান পাটুনী। হাওড়া রামকৃষ্ণপুর নিবাসী ভাগবত হরিচরণ মল্লিক মধ্যে মধ্যে হালে বসিয়া থাকেন। আমাদের আদরের নৌকাখানির তিনিও মন্দ মাঝী নন। বাবু

প্রসাদদাস বড়ালকেও এই নৌকার জনৈক দক্ষ মাঝী বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। তিনি ভাল করিয়া হালে বসিলে আমাদের এই নৌকা খানি যে মারা যাইবে না, এ আশাও আমরা করিতে পারি।

এভিন্ন শ্রীপাট নৌকার অন্য দাঁড়ী মাঝী যে নাই, এমন বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি সুবর্ণবণিক্সুত এবং দুই চারিটী সুবর্ণবণিক্ মহিলা গোপনে ইহার কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা আড়ম্বর, ঢ্যাডরা পিটিতে ভাল বাসেন না, সাধ্যমত সরল হৃদয়ে কার্য্য করেন। ইহার উপর মাঝীর-মাঝী, ভবপারকর্ণধার, স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই তরণীর কাণ্ডারীর কাজ করিতে-ছেন। সম্পদে, বিপদে আমাদের শ্রীপদে রাখিতেছেন এবং রাখিবেন, পরম গূঢ় আশা-প্রদাতা, সকল আশার "সুসার" কর্ত্তা, স্বয়ং শ্রীহরি আমাদের হৃদয়ে এই পূত আশা প্রেরণ করিতে-ছেন। নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" সম্বন্ধে অভিমতি ঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ ধর প্রণীত "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" নামক প্রবন্ধ আমি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁহার সহিত অনেক স্থলে মতভেদ থাকিলেও তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তিনি যে বলিয়াছেন, উদ্ধারণ দত্তের ন্যায় আপনার উন্নতি করিতে শিখ, তোমরাও ঠাকুর হইয়া যাইতে পারিবে, এটী বড় পাকা কথা। বৃথা পৈতা লইব, বৈশ্য হইব, ভূতি বলিয়া সহি করিব প্রভৃতি আড়ম্বর না করিয়া যদি সকলে দীন বাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন, তাহা হইলে বঙ্গের শুভদিন উপস্থিত হইবে। নচেৎ ঝগড়া বিবাদ কলহ মনান্তর উপস্থিত হইয়া বিপর্য্যস্ত সমাজকে আরও বিপর্য্যস্ত করিবে। ৬ই ভাদ্র ১৩১১।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সাধু চরিত্র পাঠে হৃদয়ের প্রশস্ততা জন্মে এবং মানুষকে সাধু, সচ্চরিত্র করে। কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর সাধুপুরুষ বলিয়া পরিগণিত ও পরিচিত। সুন্দর সহজ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত বাবু দীননাথ ধরের "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" পাঠে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৃন্দ অবশ্য প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিবেন। ধর মহাশয় কতকগুলি সঙ্গত কথা বলিয়াছেন—তাহা সুবর্ণবণিক্‌দের সবিশেষ বিবেচনার যোগ্য। হারাধন দত্তের পাতড়া লইয়া নাড়াচাড়া না করিলেই ভাল হইত।

কদমতলা, চুঁচড়া, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩১১ সাল } শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।